আব্দুল্লাহ আল মুনীর

সুখনগর

সুখনগর

আব্দুল্লাহ আল মুনীর

নিয়ন পাবলিকেশন

লেখকের কথা

পৃথিবীতে মানুষ অল্প সময়ের জন্য বাঁচে। এই সময়টাতে মানুষ সুখ খোঁজে। কেউ বুঝে খোঁজে, কেউ না বুঝে। কিন্তু সুখ তুমি কোথায়! টাকাতে? গাড়িতে? না বাড়িতে? ফুটপাতে রাতভর মশার কামড় খেয়ে যে ছেলেটি সুখনিদ্রায় বিভোর, তাকে কি অসুখী বলা যায়? কোটি টাকার কক্ষেও তো অনেকে ছটফট করে একই সময়ে—একই বয়সে।

একবার কারও মুখে শুনলাম গরীব হয়ে জন্মানোটা অভিশাপ। এরপর একটু ভাবলাম। গরীবদের শহরে তো ঘুরে বেড়িয়েছি অনেকটা সময়। তাই এই অভিশাপ শব্দটা ঠিক হজম হলো না। সুখনগর সেই বদহজমের ফল। সুখনগরে প্রবেশ করলে এমন কিছু বাস্তবতার দেখা মিলবে, যা আমরা এই রঙিন পৃথিবীর মিথ্যে পোষাকে জড়িয়ে আড়াল করে রেখেছি। চারিদিকে উন্নয়নের গল্প, প্রযুক্তির আড্ডা আর কনক্রিটের গন্ধ। সুখনগরে স্থান পেয়েছে কেবল সুখের গল্প, সুখের আড্ডা—সুখের গন্ধ।

আমার সবেমাত্র তৃতীয় উপন্যাস এটি। অত্যন্ত অপরিপক্ক ও অনভিজ্ঞ আমি। অল্প কিছু মানুষ আমাকে ভালোবেসে আটকে দেয়। তখন এক পৃথিবী লিখতে শপথ করে ফেলি। প্রতিবারের মতই বলছি, এই বইয়ের সব ভুল ভ্রান্তি চোখে আঙুল দিয়ে ধরিয়ে দিন—আপনাকে এই পৃথিবীতে যতদিন আছি মনে রাখবো। এই বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা। খুব বেশি কিছু বলতে চাচ্ছি না। সুখনগরে প্রবেশ করুন। ভেতরে অনেক কিছু অপেক্ষা করছে।

আব্দুল্লাহ আল মুনীর
টাঙ্গাইল

এক.

সকালটা বড্ড মধুর। আকাশের এক কোণে রাতের চাঁদ মুচকি হাসছে। সে তার বিদায়ের জানান দেয়ার চেষ্টা করছে। একদিক থেকে লাল লালিমা ধীরে ধীরে ভেসে উঠছে। সূয্যিমামা তার অস্তিত্বের জানান দিতে যাচ্ছে খানিক বাদেই। এ সময়ের দৃশ্য নিঃসন্দেহে অপরুপ। তবে উচ্চবিত্তদের এই আকাশ দেখার সময় কোথায়? তারা হয়ত দিব্বি নাক ডাকছে। হতদরিদ্রদের অবশ্য এ সময়টাতে লাঙল কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ার সময়। ধরণী যখন তার পুরো সৌন্দর্য ঢেলে দেয়, ঠিক তখনটায় এদের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের শুরু। মুগ্ধ করা প্রত্যুষে পাখির কিচিরমিচির ডাক তাদের হৃদয়ে কতটা নাড়া দেয়-কে জানে!

আজকের সকালটা একটু বেশিই সুন্দর। কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশে ঘন লালবর্ণের সুর্য উঠেছে। করিম মিয়া তার চায়ের দোকান খুলেছে মাত্র। কিছুক্ষণের মধ্যেই এ ছোট ঝুপড়িতে বেকার বৃদ্ধরা দলে দলে ছুটে আসবে। সকালের এই চায়ের আসর পূর্ণতা না পেলে অনেকের প্রাতঃকার্য সম্পাদনে বিরক্তি চলে আসে। করিম মিয়া তার উনুনে লাকড়ি দিয়ে নিভু নিভু আগুনকে প্রজ্বলিত করার চেষ্টায় লম্বা বাশের তৈরি বস্তুটির মাথায় ফুকছে। হোসেন মার্কেটের অন্য দোকানগুলো একটু আয়েশ করেই খুলে। এজন্য সকল বেকার বৃদ্ধর একমাত্র আস্থার নাম-করিম মিয়ার স্টল।

কাজলা গ্রামকে রুপকথার গ্রাম বললেও খানিকটা কমিয়ে বলা হবে। এই গ্রামে আছে বিস্তীর্ণ মাটির সড়ক। লাল শাপলায় ভরপুর বিল আছে, খোলা আকাশের নিচে সবুজ সামিয়ানার মত তেপান্তরের মাঠ আছে। আছে গা ছমছম করা ভূতুরে জঙ্গল। আর আছে কিছু সুখী মানুষ। এ মানুষগুলো সবসময় হাসে। এই হাসি উচ্চবিত্তরা সোফায় গা এলিয়ে আয়েশ করে বিদেশী সিগারেট ফুকেও আবিষ্কার করতে পারবে না।

এই গ্রামে জনবসতি খুবই স্বল্প বললেই চলে। গ্রামে একটিই মাত্র বাজার। যার নাম হোসেন মার্কেট। ঠিক শহর বন্দরের মার্কেট নয়, আদলে নিতান্তই গ্রাম্য বাজার। সপ্তাহের বুধবারে এই বাজারে হাট বসে। হাট বসার অর্থ হচ্ছে নানারকম কাঁচা সবজি আর বিলের মাছ নিয়ে খোলা প্রান্তরে দোকানীরা বসে থাকে। বাকি দিনগুলোতে হোসেন মার্কেটের একই দৃশ্য। চায়ের দোকানে বৃদ্ধ-বেকারদের আড্ডা। সে আড্ডায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প থেকে ক্রিকেটার সৌম্য সরকার পর্যন্ত-কারো রক্ষে নেই। চুলচেরা বিশ্লেষন হয় আওয়ামী রাজনীতি আর বিসিবি প্রধান পাপন সাহেবকে নিয়েও।

হোসেন মার্কেটের নামকরণেও রয়েছে ইতিহাস। এটাকে অবশ্য গ্রামের মানুষরা 'ইতিহাস' বলতে নারাজ। তাদের মতে এই 'ঠুনকো' বিষয়কে ইতিহাস বলা চলবে না। ইতিহাস মানেই ভারি বস্তু, গা ঘেমে যাওয়ার মতো অধ্যায়। এই বাজারে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি ছোট্ট ঝুপড়ীতে চিপস্ লজেন্স নিয়ে দোকানী সেজে বসেছিলেন তার নাম হোসেন মিয়া, সেই থেকে বাজারের নাম হোসেন মার্কেট। দিনের পর দিন পেড়িয়ে বাজার এখন বেশ বড়। দোকানও হয়ে গেছে বিশের অধিক। হোসেন সাহেবের দাড়ি চুল সাদা হয়েছে। কিন্তু সগৌরবে তার নামেই চলছে হোসেন মার্কেট।

গ্রামের মানুষগুলো সহজে অকৃতজ্ঞ হয় না। বিশেষ করে নামকরণের ক্ষেত্রে তো মোটেও না। সেই কৃতজ্ঞতাবোধ বলে দেয়, কাজলা গ্রামের কাঁচা সড়কগুলো পিচঢালা হয়ে এই বাজারে বহুতল শপিং কমপ্লেক্স নির্মিত হলেও তার নাম এই হোসেন মার্কেটই থাকবে।

'ও করিম মিয়া! চা হইলো?' ফারুক মিয়া জিজ্ঞেস করলো।

করিম মিয়া লাকড়িগুলো নাড়াতে নাড়াতে বললো, 'হ ভাইজান!'

'আসেন ইমাম সাব! আমরা বসি।'

গ্রামের একমাত্র মসজিদের ইমাম সাহেব মাওলানা আহমাদুল্লাহ, ফারুক মিয়া, রফিক মিয়াসহ চার পাঁচজন ফজর শেষ করে হাটছিলো। তাদের নিত্যদিনের রুটিন, সকালের স্নিগ্ধ বাতাস গায়ে মেখে করিম মিয়ার উনুনের এক কাপ চা খেয়ে দিন শুরু করা। এই অভ্যাস অবশ্য পূর্বে ফারুক মিয়ার ছিলো না। ইমাম সাহেব এই গ্রামে আসার পর থেকে তার সংশ্রব ফারুক মিয়াকে নামাজী বানাবার পাশাপাশি এই অভ্যাসটাও দিয়েছে।

ফারুক মিয়া মাঝে মাঝে একলা সময়ে ভাবে, জীবনের কতগুলো সুন্দর ভোর হারিয়ে গেছে। তখন ঘুম ভাঙতো ঠিক ১০ টায়। স্ত্রী রোজিনা বেগম ততক্ষণে রান্নাবান্না শেষ করে চেঁচামেচি শুরু করতো। খাবার শেষ করে দোকানে বসতে বসতে ১১টা বেজে যেত। দিনের শুরুরভাগের খদ্দেররা অন্য দোকানগুলো থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিয়ে নিত। ব্যবসার অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকে যাচ্ছিলো। শেষ পর্যন্ত ফারুক মিয়াকে তার পুত্র ও ইমাম সাহেব মিলে জোর করে তাবলীগে পাঠিয়ে দেন। শান্তশিষ্ট অমায়িক মানুষ ফারুক মিয়ার একমাত্র ঘাটতি ছিলো ধর্মেকর্মে। যা তারপর ভালোভাবেই ঠিক হয়ে যায়। এখন সে নিয়মিত ফজরের নামাজ পড়ে। নামাজের পর ঘুম পুনরায় যেন আক্রমণ না করে বসে, সেজন্য সামান্য হাঁটাহাটির পর করিম মিয়ার স্টলে চায়ের আসরে বসে। এরপরই তার দিন শুরু হয়।

এই দিন শুরুর অধ্যায়টিতে তাকে সঙ্গ দেন ইমাম সাহেব। শুরুর দিকে তারা দু'জন থাকলেও দল এখন বেশ ভারী। যুক্ত হয়েছে অলস কিসিমের বেশ কয়েকজন। ইমাম সাহেব সবাইকে বোঝাতে পেরেছেন 'নামাজের সাথে কত শত বরকত সম্পৃক্ত রয়েছে'।

'তা ফাহাদ বাজান কই! আজ তারে দেখতেছিনা যে!' করিম মিয়া ফারুক মিয়াকে জিজ্ঞেস করে।

'সমেজ আলির নাকি অসুখ হইছে। তাকেই দেখতে গেছে।' ফারুক মিয়া উত্তর দেয়।

করিম মিয়া চায়ের কাপে গরম পানি ঢালতে ঢালতে বলে- 'আল্লাহ আপনারে একখান রত্ন দিছে। আহ! আর আমগো পোলাপান একেকটা বদের হাড্ডি।'

'হ ভাইজান! সেই জন্যই তো জীবনে কোনো দুঃখ নাই।' ফারুক মিয়া বলে।

যাকে নিয়ে কথা হচ্ছে তার নাম—ফাহাদ। ফারুক মিয়ার একমাত্র পুত্র। ফাহাদ নামটি কাজলা গ্রামে শুধু পরিচিত নয়, সুপরিচিত। এই একটি নাম শুনে প্রচণ্ড ক্ষোভে রক্তিম ব্যক্তিও মুহূর্তেই শান্ত হয়ে যায়। ফাহাদ খুব প্রভাবশালী ব্যক্তির পুত্র নয়। গ্রামের অন্য সাধারণ মানুষগুলোর মতই একজন 'ফারুক মিয়ার' সন্তান। পড়ালেখায় সে অনার্স শেষ করেছে। এরপর উচ্চতর কোন ডিগ্রী অর্জন করে ভালো বেতনের কোন চাকুরী নিয়ে তার চিন্তা নয়, বরং কাজলা গ্রামকে রুপকথার গ্রাম তৈরি করতে সে হয়েছে বদ্ধ পরিকর। তার সপ্ন সাধনা ও ধ্যান জ্ঞান কেবলমাত্র এই গ্রাম আর এই গ্রামের মানুষগুলোকে নিয়ে।

গ্রামের হতদরিদ্র মানুষগুলোকে বুকে টেনে নেয় ফাহাদ। সারাদিন ব্যয় করে অভাবী আর অসুস্থদের খোঁজখবর নেয়ায়। এজন্য অবশ্য ফারুক মিয়ার কোন হতাশা নেই। সে বরং খুশি এমন সুপুত্র পেয়ে। রোজিনা বেগম টুকটাক গালমন্দ করলেও মাঝরাতে মাঝেমধ্যে ফারুক মিয়াকে ঘুম থেকে ডেকে বলে, 'তুমি দেইখো! তোমার দোকান আর টুকটাক ক্ষেত খামার থেকে আমরা ঠিকই সুখে দিন পার করতে পারমু, ফাহাদরে নিয়া আমার কোন চিন্তা নাই, ও যা করতাছে তা আমরা ওপরওয়ালা থেকে পামু।'

ফাহাদ ২৫ এ পা রেখেছে। এরই মধ্যে সে তার গ্রামকে তার স্বপ্নের কাজলা গড়ে তুলতে অনেক পথ এগিয়ে গেছে। এই গ্রামে ঘুষখোর নেই। অভাবী আর অসুস্থ আছে—কিন্তু অসুখী নেই। এই গ্রামে নেই অশ্লিলতার কোন ছোঁয়া।

যুব-সমাজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ার মত ভয়ংকর মাদকেরও স্থান নেই কাজলায়। এসবের পেছনে রয়েছে একমাত্র ফাহাদের কার্যকরী ভূমিকা।

না! ফাহাদ একা নয়। ফাহাদের পাশে এখন অনেক মানুষ, অনেক সমর্থন। তবে ফাহাদ যখন লেখাপড়া শেষ করে তার এই স্বপ্নের বাস্তবায়নে মাঠে নেমেছিলো, তখন ফাহাদের পাশে তার পরিবার বা অন্য কেউ নয়—দাড়িয়েছিলো একজন।

তিনি হলেন ইমাম সাহেব। মাওলানা আহমাদুল্লাহ। প্রত্যেক গ্রাম বা শহরে প্রভাবশালী একজন নেতা থাকে, যার পরামর্শে এলাকার ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম কর্ম সম্পাদন হয়। এই গ্রামে নেই রাজনীতির ছোঁয়া, তাই তেমন নেতাও নেই। সে স্থানে গ্রামের মানুষ বসিয়েছে ইমাম সাহেবকে। শুধু ধর্মীয় বিষয় নয়, ইমাম সাহেব গ্রামের প্রতিটি যৌথ কাজে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এক সময় কাজলায় ধর্মকর্মের বালাই ছিলো না। শতভাগ মুসলিম পরিবার থাকা সত্ত্বেও জীর্নশীর্ণ এক মসজিদে দু'চারজন বৃদ্ধ ছাড়া পাওয়া যেত না কাউকেই। এই ইমাম সাহেব চাকুরী পাওয়ার পর বদলে গেছে মসজিদের চিত্র। মুসল্লী বেড়ে গেছে এবং মসজিদটাও পাঁকা হয়েছে। পৃথিবীর বুকে অনন্য এক নজির স্থাপন করেছে কাজলা গ্রাম। যে গ্রামে কোনও বিল্ডিং নেই, সেমিপাকা ঘরও নেই, কিন্তু রয়েছে দৃষ্টিনন্দন একতলা মসজিদ। এখন আজান হলে করিম মিয়ার স্টলের মত অন্য দোকানগুলোতেও টিভি বন্ধ করে দেয়া হয়। দলে দলে সবাই ছুটে চলে মসজিদের দিকে।

ইমাম সাহেবের ব্যবহার খুবই অমায়িক। তিনি সদা হাস্যোজ্জ্বল থাকেন। গ্রামের সবাইকে আপন ভাই বা ছেলের মত বুকে টেনে নেন। মসজিদের পাশেই গ্রামের মানুষরা মিলে ফাহাদের নেতৃত্বে ইমাম সাহেবকে একটি বাড়ি তৈরি করে দিয়েছে। এখানেই তিন ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে তার বসবাস। একে একে ১২টি বছর অতিবাহিত হয়েছে। ইমাম সাহেব কাজলা গ্রামটির সাথে এতটাই মিশে গিয়েছেন যে কখনো নিজের পিতৃভুমিতে ফিরে যাওয়ার কল্পনাও করতে পারেননি। ইমাম সাহেবের শুরুটাও যে এমন ছিলো–তা নয়। তিনি একা একা মানুষকে নামাজের জন্য ডেকে যেতেন। লোকেরা কান বন্ধ করে শুনতো। এরপর তার সহযোদ্ধা হয়ে আসলো ফাহাদ। দু'জনে মিলে গ্রামে এনেছেন আমূল পরিবর্তন। এখন মানুষ এই দু'জনের পরামর্শ ব্যতিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু করার সাহস করে না। গ্রামের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয় এখন মসজিদের আঙিনায়।

ছবির মতো সুন্দর গ্রাম এখন মানবতা আর সামাজিকতার দিক থেকেও শ্রেষ্ঠ। ফাহাদ মাঝেমধ্যে সুখবুলি উচ্চারণ করে, 'আমি বলেছিলাম না! এই গ্রামে কোন অসুখি ব্যক্তি থাকবে না!'

ইমাম সাহেব চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, 'শুনেন করিম মিয়া! হায়াত তো বেশিদিন নাই বাকি। এইবার নামাজটা শুরু করেন।'

'জি হুজুর! ফাহাদ বাজানও মাঝেমধ্যে এই কথা কয়। কিন্তু জানেন তো! চৌদ্দ জনমের অভ্যাস থেইকা বের হইতেও মেলা কষ্ট।'

'আরে বাজান! আমি তো দেখি, আজান দিলে আপনি পোলাপানগো বইলা বইলা মসজিদে পাঠান। এইবার নিজে নামাজ পড়লে একদিকে নামাজের সওয়াব পাবেন, আরেকদিকে দাওয়াতের সওয়াবও পাবেন। নামাজ না পড়লে কষ্ট কি জাহান্নামে আল্লাহ এরচেয়ে কম দিবো?' মমতার সুরে বললেন ইমাম সাহেব।

'জাহান্নামের কথা বইলেন না হুজুর! খুব ডরাই ঐ জায়গারে। আমি নামাজ শুরু করমু ইনশাআল্লাহ।'

'এইতো বুদ্ধিমানের কথা কইছেন। চলেন ফারুক মিয়া! আমরা এইবার উঠি। সকাল হইয়া গেছে।' চা শেষ করে ইমাম সাহেব বললেন।

করিম মিয়ার জীবনটা ছিলো ঢের কষ্টের। খুব ছোটকাল থেকে সে দরিদ্র পরিবারে বড় হয়েছে। বাবা-মা মারা যাবার পর এ বাড়ি ও বাড়ি কাজ করে খেয়েছে সে। বয়স যখন ১৭ তখন তারই মত আরেক এতিমকন্যা জামিলা খাতুনকে বিয়ে করে এক অভাবী সংসার শুরু করে। ধীরে ধীরে সঞ্চিত কষ্টের টাকা দিয়ে হালচাষ আর টুকটাক ব্যবসায় সে উঠে দাড়িয়েছিলো। একসময় বেশ ভালোই টাকা হয়েছিলো তার। দুই ছেলেকে পড়াশুনা করিয়ে বড় করে। এই তারাই একসময় বাবার সব সম্পত্তি দখল করে চলে যায় অন্যত্র।

করিম মিয়া তখন পুরোপুরি নিঃস্ব। নামেমাত্র একটি ঘরে জামিলা খাতুনকে নিয়ে তার অভাবের জীবন পুণরায় শুরু হয়। এবারের কষ্ট যেন মন মানতে চায় না। ছেলেগুলোকে শিক্ষা ঠিকই দিয়েছিলো করিম মিয়া, কিন্তু আদর্শ শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়েছিলো সে। করিম মিয়া অভাবে অনাহারে দিন পার করছিলো। ঠিক তখন তার পাশে দাঁড়ায় ফাহাদ। গ্রামের সবার থেকে চাঁদা তুলে করিম মিয়াকে চায়ের দোকান খুলে দেয়। এখান থেকেই উঠে দাঁড়ায় করিম মিয়া আর জামিলা খাতুনের ছোট বিচর্তু সংসার। করিম মিয়া ভাবছে, যে শিক্ষা না দেওয়ার কারণে ছেলেগুলো লাথি মেরে চলে গেলো, সে শিক্ষা সে এখনো নিজের ভেতরেই আনতে পারেনি। আরো লাথি খেলে কী শিক্ষা হবে?

নাহ! নামাজটা আজই শুরু করতে হবে। ঘরে গিয়ে জামিলাকেও বলতে হবে সেও যেন নামাজ ধরে।

দুই.

মুফিজ সাহেব বেশ বিরক্তির সাথে ফোন রিসিভ করে বলল, 'কী হয়েছে সমির! এত রাতে কেন ফোন দিয়েছ?'

'স্যার! একটা ছোট্ট ঝামেলার খবর আছে!' কাপাকণ্ঠে মুফিজ সাহেবের সেক্রেটারি বলল।

'তুমি কথা বাড়িয়ে আরেকটা ঝামেলা বৃদ্ধি না করে ঝেড়ে কাশো!' ধমকের স্বরে বলল মুফিজুল ইসলাম।

'স্যার! আজ রাতে ডিবি পুলিশ আবারও আপনার গুলশানের বাসায় অভিযানে যাবে, আপনি কী ওখানেই আছেন স্যার?'

'বোকার মত প্রশ্ন কোরো না। আমি আর কোথায় থাকব? আসামিদের মত পালিয়ে বেড়াব নাকি?'

'না স্যার! তবে পুলিশ আপনাকে পেলে হয়ত জিজ্ঞাসাবাদ করবে। সাথে কিছু সাংবাদিকও যাবে।

'ওকে। সে নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। খবরটা কে দিলো তোমাকে?'

'এক ঘনিষ্ঠ ডিবি মারফত জেনেছি স্যার! তাকে সামান্য খুশিও করতে হয়েছে স্যার!'

ফোন কেটে দিলো মুফিজ সাহেব। সে জানে সমির এখন নিজের কৃতিত্ব গেয়ে ভালো সাজার চেষ্টা করবে। এই দুঃসময়ে সেই গান কুকুরের ডাকের মত শোনাবে। ডিবি এর আগেও গুলশানের এই বাসায় এসেছে। বাসাটা তারা 'গুলিস্তানের' মত একনামে চেনে। রাত তিনটা বাজতে ২ মিনিট বাকী। রাস্তাঘাট ফাঁকা। পুলিশ আসতে সময় নেয়ার কথা নয়। মুফিজ সাহেবের স্ত্রী ফারহানা বেগম ঘুমোচ্ছে। এই মহিলার ঘুম ভাঙালে পুলিশের চেয়ে ঢের বেশি যন্ত্রণা সেই দিবে।

বাংলাদেশের শীর্ষ ধনীদের তালিকা নতুনভাবে প্রকাশ হয়েছে কয়েকদিন হলো। ছয় থেকে তিনে উঠে এসেছে মুফিজুল ইসলাম। এ নিয়ে খুশির চেয়ে আক্ষেপ বেশি মুফিজ সাহেবের। ছয় নয় নিয়ে সরকার আর পুলিশ কারও মাথাব্যাথা থাকেনা। সেরা তিন নিয়ে সবারই মাথা গরম। স্কুলের রোল থেকে শুরু করে হাজী'র বিরিয়ানির র‍্যাংকিং পর্যন্ত পৃথিবীর সব কাজে সেরা তিন নিয়ে হৈ চৈ।

মাত্র এক নম্বরে পিছিয়ে থাকা চারকে নিয়ে এর সিঁকিভাগ নাড়াচাড়াও নেই। শীর্ষ ধনীদের তালিকায় তিনে আসার আগেই পরবর্তী ঝামেলা নিয়ে চিন্তা করেছিলো মুফিজ সাহেব। মুফিজ সাহেবের এ পর্যন্ত আসার গল্পটা সুখের নয়। প্রচুর কষ্ট করে সামনের দিকে এসেছে সে। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে সব কষ্ট ছিলো অবৈধ সড়কে। বৈধভাবে টাকা উপার্জন করলে মুফিজ সাহেব এতদিনে খুব বেশী হলে বনানীতে একটি ফ্লাটের মালিক হতো। কিন্তু এখন ঢাকা শহরে তার দশের অধিক বিলাস বহুল বাড়ি রয়েছে। কক্সবাজারে ফাইভস্টার হোটেল, ঢাকায় একটি শপিং কমপ্লেক্স, তিনটি গার্মেন্টস, বেশ কিছু হাউজিং প্রপার্টিসহ বিদেশের সুইস ব্যাংকে গচ্ছিত আছে অগনিত টাকা। মুফিজ সাহেবের বাবা-মা মারা গেছেন সাত বছর হলো। ঠিক সুখের মৃত্যুও হয়নি তাদের। নানা অপরাধে মুফিজ সাহেবকে নিয়ে সংবাদ আসতো তাদের কানে। বারংবার নিষেধ করায় মুফিজ সাহেব বাবা-মাকে পৃথক বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়।

অপরাধের দুনিয়ায় ক্রমেই বাদশা হতে থাকে মুফিজুল ইসলাম। ছেলের বেহাল দশা দেখে খুব বেশিদিন পৃথিবীতে থাকতে পারেননি তারা। মুফিজ সাহেবও হাফ ছেড়ে বাঁচে। এরপর সাত বছরে নিজের অবৈধ সম্পদ দিয়ে ভালো সেজেছে সমাজে। ক্যামেরার সামনে মাঝেমধ্যেই গরিবদের অঢেল সম্পদ দান করে সংবাদমাধ্যমের শিরোনাম সাজেন 'মুফিজ সাহেব'। এসব সংবাদের আড়ালে চাপা পড়ে থাকে যুবসমাজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া সর্বনাশী ইয়াবা ব্যবসায়ী মুফিজুল ইসলামের নাম। যে মাদকদ্রব্য বিক্রি করে তিলে তিলে সম্পদের পাহাড় গড়েছে সে। মুফিজ সাহেব ভাবতো, পৃথিবীতে বাঁচার জন্য সম্মান আর টাকার প্রয়োজন রয়েছে, আর টাকা হলে সম্মানটাও কিনে পাওয়া যায়।

তবে এই পঞ্চান্ন বছর বয়সে এসে সে মাঝে মাঝে ভাবে, বাঁচার জন্য সুখটাও বড্ড প্রয়োজন। মুফিজ সাহেবের সব আছে, শুধু সুখটা নেই। এসব ভাবনা অবশ্য খুব বেশি স্থায়ী হয় না। বিদেশী বিয়ারের নেশা কেটে গেলে এই ভাবনাগুলোও বাতাসে উড়ে যায়। আবার ফিরে আসে হিংস্র জঘন্য–মুফিজুল ইসলাম।

'হ্যালো আদিব! জেগে আছো?' আড়ষ্টকণ্ঠে বলল মুফিজুল ইসলাম।

'হ্যাঁ! তারকারা রাতে ঘুমায় না জানেন না!' ভারী গলায় উত্তর দিল আদিব শাহ।

'আরে রাখো তোমার তারকা ফারকা! একটু ঝামেলা হয়ে গেছে!'

'মধ্যরাতে কী হলো বলুন তো!'

লেখক পরিচিতি

আজ থেকে বছর দু দশক দুই আগে প্রতিভাধর এই লেখক যমুনা নদী তীরবর্তী টাঙ্গাইল শহরের কোনো এক ছোট্ট কুটিড়ে কুপিবাতি হয়ে আগমন করেন। বিদ্যাপীঠে পদার্পণের পর থেকেই লেখালেখিতে ভীষণ মজে যান এই কলমচালক।

'আঁধারে জোছনা জ্বলে' নামক উপন্যাসটি লেখকের প্রথম কাগুজে সন্তান। লেখকের দ্বিতীয় কাগুজে সন্তানটিও প্রথম সন্তানের অনুরূপ; নাম–'নির্ভীক নিশাচর'। এছাড়াও আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ মিয়ানমারের মুহাজির রোহিঙ্গা জ্ঞাতিগোষ্ঠীর করুণ দুঃখ-দুর্দশার কাহিনি নিয়ে যৌথভাবে সংকলন করেন 'নাফ নদীর এপার ওপার'। পিছিয়ে নেই তিনি অনুবাদ সাহিত্যেও। 'সুন্নাত ও বিদআতের হাকীকত' তার প্রথম অনূদিত গ্রন্থ; যেটি কিনা এখনও পাঠকমহলে বেশ সুপরিচিত এবং অতি সমাদৃত। এছাড়াও পাঠকপ্রিয় এই লেখকের স্বরচিত, অনূদিত বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিতব্য।

সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত নবীন লেখক-লেখিকাদের একটি অনলাইন প্লাটফর্ম 'স্বপ্নধনু'র প্রধান সম্পাদক হিসেবে তিনি দায়িত্বরত আছেন। সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক এবং অনলাইন পত্রিকাদিতে অনবরত লিখে চলেছেন ঋদ্ধ এই লেখকমহাশয়।

ভীষণ মেধাবী এই লেখক মাত্র আট বছর বয়সে কালামুল্লাহ হৃদয়ে অনুলিখন করেন। হিফয সমাপ্ত হলে স্বভাবতই প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের পাঠ চুকিয়ে নেন চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক মেখল হামিউস সুন্নাহ মাদ্রাসায়। দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসা থেকে তিনি দাওরায়ে হাদিস (মাস্টার্স) সম্পন্ন করেন। মহা মহিম রব আমাদের সবার অতি প্রিয় এই লেখককে তাঁর দ্বীনের জন্য কবুল করে নিন। আমিন।

আব্দুল্লাহ আল মুনীর নামক এক সুরুজের সুস্থ সাহিত্যের বিভাকিরণে গোটা বঙ্গালমূলক আলোকিত হয়ে ওঠুক এই কামনাই করি মহিয়ান-গরিয়ান রবের তরে।

মুহাম্মাদ সাজেদুল ইসলাম
-তরুন লেখক ও গল্পকার